নির্জনপুরে আতঙ্ক

দিবাকর দাস

৯৭

মির্জাপুরে মহাতঙ্ক

দিবাকর দাস

© সতীর্থ প্রকাশনা

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০২৪
প্রচ্ছদ: পরাগ ওয়াহিদ
সম্পাদনা: প্রকাশক
বানান সংশোধন: শারমিন আক্তার
স্কেচ: আবু আনন্দ নিটু

সতীর্থ প্রকাশনা'র পক্ষে ১০/ক, জেলা পরিষদ মার্কেট (নানকিং দরবার হলের সামনে), মনিবাজার, রাজশাহী ৬০০০; যোগাযোগ: ০১৭৩৭৭২৪১৭০ থেকে **মো. তাহমিদুর রহমান** কর্তৃক প্রকাশিত এবং রংধনু অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত; ০১৭৩০-৯১৯৭৭৭

বাংলাবাজার শাখা: দোকান নং – ১১৭, গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য: দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Price: 250TK | INR: 250 | USD: 7$

Mirzapure Mohatongko [Novela] by **Dibakor Das**
Published by **Md. Tahmidur Rahman**, **Satirtho Prokashona**,
10/ka, Zila Porishod Market, Monibazar, Rajshahi
Published: December, 2024
ISBN: 978-984-99075-5-8

বন্ধুত্ব হোক বইয়ের সাথে...

উৎসর্গ

সেই সব কিশোর-কিশোরীদের–
যারা পৃথিবী কী বোঝার আগেই
এই পৃথিবীর জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছে।

লেখকের কথা

একটা কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, আমরা আমাদের উৎকৃষ্ট সময়টা কিশোর বয়সেই কাটাই। মানুষ মাত্রই দিবাস্বপ্ন দেখে। এখনও দিনের অলস সময়ে যখন ভাবনার জগতে সুতো বোনার সময় পাই, তখন আমি নিজেকে বিলাসবহুল কোনো সফলতার ক্ষেত্রে দেখতে পাই না। মনকে নিজের ঘোড়ায় ছুটতে দিলে সে আমাকে আমার অজান্তেই নিয়ে যায় আমার শৈশব কৈশোরের সেই মফঃস্বলে।

সেই মাঠে যেখানে ছুটে নানা খেলা খেলার সময় আমার অথবা আমাদের ভেতর দিনদুনিয়ার কোন খেয়াল কাজ করতো না। মাঠের পাশের চলমান নদীর ভাটি স্রোতে আমি যেন এখনো নেমে পড়তে পারি অনায়াসে, গায়ে যেন লাগে সেই জলের ঘোর হিম। আমার শরীর জুড়িয়ে আসে নিমেষে।

'মির্জাপুরে মহাতঙ্ক' গল্পে একটা জমজমাট গল্প আছে, রোমাঞ্চ আছে, প্রশ্ন আছে, উত্তর আছে। তবে সবচেয়ে গভীরে লুকিয়ে আছে, একজন কৈশোর পেরিয়ে আসা মানুষের কৈশোরে ফিরে যাবার অদম্য ইচ্ছে। সময়ের বিপরীতে ছুটে যাবার ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট প্রয়াস। আশা করি, কৈশোর পেরিয়ে আসা পাঠকেরা কিছুক্ষণের জন্য হলেও গল্পের সাথে ফিরে যাবেন নিজেদের সেই মহানন্দের সময়ে। আর যারা কিশোর বয়সেই এই গল্প পড়ছে, তারা বুঝতে পারবে, তারা বাস করছে নিজেদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়ে।

- দিবাকর দাস

মিঠাপুরে ম্যাজিক

প্রভু ঈশ্বর বললেন, "দেখ, ওরা এখন ভালো আর মন্দ বিষয়ে জেনে আমাদের মতো হয়ে গেছে। এখন মানুষটা জীবনবৃক্ষের ফল পেড়েও খেতে পারে। আর তা যদি খায় তবে ওরা চিরজীবী হবে।"

(জেনেসিস ৩,২২)

পূর্বকথা

হার্মিস তার কক্ষে অন্ধকারে বসে আছেন। আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করছে না। তিনি দেবতা। তার ক্ষীণ ইশারাতেই আলো জ্বলে উঠবে। কিন্তু অস্থির মনে তার কখনও আলো ভালো লাগে না। অন্ধকারে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুটো কাজই ভালো হয়। অনেক ভাবার পর সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন তিনি। এছাড়া মনের শান্তি লাভের আর কোনো উপায় নেই। তিনি তার প্রধান কিপারকে ডাকলেন। দেবতার সেবকদের কিপার বলে।

প্রধান কিপার হেবল, দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। এই ঘরে কোনো অবস্থাতেই প্রবেশ করা যাবে না। কোনো কথা না বলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। হার্মিস তার আগমন বুঝতে পারলেন। বললেন, "হেবল, আমাদের প্রাণের সন্ধান করতে হবে। তৈরি হও।"

কেঁপে উঠল হেবল। এই একটা আশঙ্কাই ঘুরে ফিরে তার মাথায় ঘুরছিল এতদিন। ভয়ে ভয়ে সে বলল, "কিন্তু প্রভু, অমৃত পানীয় আর এম্ব্রোসিয়া আমাদের এমনিতেই চিরকাল অমর রাখবে। প্রাণের সন্ধান করা আমাদের জন্য অর্থহীন।"

হার্মিস গম্ভীর গলায় বললেন, "চারদিকের এই নিষ্প্রাণ রুক্ষতার মাঝে বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। দেবরাজ জিউস আমাকে এই অভিশপ্ত রাজ্যে নির্বাসিত করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন তিনি। কিন্তু আমি হেরে যাব না। এই ধূসর রাজ্যকে আমি প্রাণবন্ত করে তুলব। প্রাণের বিস্তার ঘটবে এখানে। নতুন প্রাণের সর্বময় প্রভু হবো আমি। একমাত্র প্রাণের আদি উৎসই পারবে জিউসের এই অভিশাপ কাটিয়ে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে।"

হেবল বলল, "কিন্তু প্রাণের উৎস নিয়ে আসলে তার পেছন পেছন মৃত্যুও আসবে। আমরা মরণশীল হয়ে যাবো। এম্ব্রোসিয়া আর জীবন আরক আমাদের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না।"

হার্মিস দৃঢ় স্বরে বললেন, "সেই চিন্তা তোমায় করতে হবে না। হেডিসের সাথে আমি কথা বলব। আমার নিয়ন্ত্রিত প্রাণকে পরকালে হেডিসের দাসত্ব করতে হবে। তুমি আরও দুইজন কিপারকে নিয়ে পৃথিবীতে যাও। প্রাণের সন্ধান করো। কিন্তু সাবধান, মনে রেখ পৃথিবীতে তোমরা অমর নও। হেডিস তোমাদের আত্মার অধিকারী হয়ে যাবে তখন।"

হেবল বলল, "আরেকটা কথা প্রভু। প্রাণের উৎস পৃথিবী থেকে নিয়ে এলে পৃথিবী মরা, ধূলিময় গ্রহে পরিণত হবে। পঞ্চভূত হারিয়ে যাবে। অমৃতের আশীর্বাদ তারা এখনও পায়নি। পৃথিবীতে প্রাণের বিনাশ ঘটলে, তাদের রক্ষাকর্তা জিউস আপনার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন।"

হার্মিসের স্বর একটুও নরম হলো না। দৃঢ় স্বরে বললেন, "আমি তো একবার বলেছি, আমি এখন কোনো কিছু পরোয়া করছি না। এই রাজ্য আমার। এই নির্বাসিত ভূমিকে আমি অলিম্পাসের চেয়েও সুন্দর রাজ্যে পরিণত করব। এটাই হবে অদূর ভবিষ্যতে দেবতাদের রাজধানী। স্বয়ং জিউসের সাথে যুদ্ধেও আমি পেছপা হবো না। পৃথিবী নামের তুচ্ছ একটা গ্রহ আমার কাছে একচুলও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তোমাকে যা বললাম, তাই কর।"

আর কিছু বলল না হেবল। নিচু মাথায় দরজার সামনে থেকে চলে এলো। অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। হার্মিসের আদেশ অমান্য করা তার পক্ষে অসম্ভব।

অধ্যায় এক

তমালের বিকেলবেলাটা অসহ্য লাগে। মির্জাপুর আসার পর তিন মাস এখনও পেরোয়নি। নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে তার। বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়। এই সময় একটা নতুন সত্তা তৈরি হয় তার মাঝে। বিদ্রোহের আগমন ঘটে কচি প্রাণে। প্রচলিত সব নিয়ম, সব সত্য অস্বীকার করার একটা বহুল প্রবণতা দেখা যায়। চেনা পৃথিবী অচেনা হয়ে যায়। বদলে যায় চেনা স্পর্শ, স্নেহ, ভালোবাসা সহ সকল পরিচিত অনুভূতিগুলো।

তমাল ক্লাস এইটের ছাত্র। ধানমণ্ডি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়ত। তার বাবা ইঞ্জিনিয়ার। বেশ বড়সড় একটা কোম্পানিতে উঁচু পদে চাকরি করেন তিনি। কাকডাকা ভোরে; যদিও ধানমণ্ডির অভিজাত পাড়ায় কাক ডাকে কিনা আমার জানা নেই, সেই সময় তিনি বেরিয়ে পড়েন। সপ্তাহের ছয়দিন এক রুটিন। একটা দিন তমাল বাবার চেহারা দেখতে পেত। তমালের ব্যস্ততাও কম ছিল না। স্কুল, কোচিং, হোমওয়ার্কের গ্যাঁড়াকলে সময় রকেটের মতো ছুটে যেত যেন। সবই শৃঙ্খলবদ্ধ কাজ। শুধু বিকেলে ঘণ্টাখানিক বন্ধুদের সাথে পার্কে খেলত। চব্বিশ ঘণ্টায় ঐ এক ঘণ্টা স্বাধীনতা।

ক্রিকেটই খেলত ওরা বেশির ভাগ সময়। ধানমণ্ডির মাঠগুলোতে ক্রিকেট খেলা একটা মজার ব্যাপার। ঘন জনবসতির তুলনায় মাঠের সংখ্যা সমুদ্রে গোষ্পদের মতো। এক মাঠে একই সাথে আট দশটা ক্রিকেট ম্যাচ চলে। ফলে কার বল যে কখন কার কাছে যায়, কে যে কার ফিল্ডিং করে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। মাঝে মাঝে দেখা যায়, একই বোলার এক ওভারে তিন চার রঙের বল দিয়ে বোলিং করছে। এর মধ্যে কোনোমতে খেলা শেষ করতে হয়। কপাল ভালো, এই খেলাগুলোর কোনো পরিসংখ্যান রাখা হয় না। তাহলে পরিসংখ্যানবিদদের খবর ছিল।

তমালের বাবার কোম্পানি নতুন একটা ফ্যাক্টরি দিয়েছে মির্জাপুরে। বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তমালের বাবাকে প্রথমে একটা বড় প্রমোশন এবং পরে এর থেকেও বড় একটা দায়িত্ব দিয়ে মির্জাপুর বদলি করা হয়েছে। ঢাকার ঝকঝকে ফ্ল্যাট খালি করে মির্জাপুরে একটা আধপুরনো একতলা বাড়িতে এসে উঠেছে তমালরা।

আসার পরপরই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে তমালকে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের স্কুল নিয়ে আজকালকার বাবা-মাদের চিন্তার অন্ত থাকে না। কঠিন ভর্তি পরীক্ষা, বড় অংকের ডোনেশন, মন্ত্রি-এমপির সুপারিশ—যে কোনো একটা উপায়ে সন্তানকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করা চাই-ই চাই। তমালের বাবার ক্যারিয়ারের সফলতার প্রথম বলি তমালের পড়াশোনা। ধানমণ্ডি রেসিডেন্সিয়াল থেকে একেবারে মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলের নামটা ঠিকমতো পড়া যায় না। উচ্চের 'উ' মুছে গিয়ে নামটা 'মির্জাপুর চ্চ বিদ্যালয়ে' পরিণত হয়েছে।

স্কুল যে তেমন আহামরি কিছু হবে না তা প্রথম দেখাতেই তমাল বুঝে গিয়েছিল। প্রধান শিক্ষকের কক্ষে গিয়ে তার ধারণা পাকাপোক্ত হলো। আগের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরে দু'চারদিন প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হতো। পিয়নের কাছ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নিয়ে কেউ তাঁর সাথে দেখা করতে পারত না। ফোনে কথা বলতে হলে তিন-চারটা ধাপ পেরোতে হতো। এখানে এসবের বালাই নেই। হেডমাস্টারের ঘর যেন স্কুলের কমনরুম। যার যেভাবে খুশি আসছে, যাচ্ছে। কুশল সংবাদ, হাঁড়ির খবর, জমির দালালি কোনো কিছুই আলোচনায় বাদ থাকছে না।

হেডমাস্টারের নাম আবুল হোসেন। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বেশ মজা পেল তমাল। ফিক করে চলে আসা হাসিটা ভদ্রতা করে গিলে ফেলল। পরনে একটা আধময়লা সাদা পাঞ্জাবি। সাথে ম্যাচ করা পায়জামা। চিবুকের সাদা দাড়িগুলোর একটা বড় অংশ পানের পিকে লাল হয়ে আছে। পাঞ্জাবির গলা আর বুকের কাছেও এক অবস্থা।

যথারীতি এখনও পান চিবুচ্ছেন। দেখে এটুকু বোঝা গেল, বোধহয় ঘুমের সময় পান চিবান না ভদ্রলোক।

পিকভরা হাসিমুখে তমালকে ভর্তি করে নিলেন আবুল সাহেব। কোনো ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নই ওঠে না, মৌখিক ভাবেও তমালকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হলো না। অথচ ওর স্পষ্ট মনে পরে, রেসিডেন্সিয়ালে ভর্তির সময় এক বছর আগ থেকে ওকে ভর্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। নিয়মিত কোচিং করত সে। তুমুল যুদ্ধের পর ভর্তি হতে পেরেছিল। সেই জায়গা থেকে এ কোথায় এসে পড়ল! একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো তমালের বুক থেকে।

মনের দুঃখ চাপা দিয়ে প্রথম দিনের ক্লাসে গেল তমাল। মন খারাপের সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সে। প্রথম ক্লাস ইংরেজি। ইংরেজি শিক্ষকের নাম হাসান শেখ। ওনার উচ্চারণ শুনে মনে মনে হাসল সে। ভদ্রলোক যে উচ্চারণে শব্দগুলো বলছেন, তাতে শব্দগুলো আর যে ভাষারই হোক, নিশ্চিতভাবে ব্রিটিশদের পরিচিত নয়। ক্লাসের শেষ পর্যায়ে এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "এই, 'আমি ভাত খাই' ইংরেজি কী?"

যাকে জিজ্ঞেস করা হলো সে তখন অন্য ধ্যানে ছিল। অঘটিত দুষ্টুমির পরিকল্পনায় হঠাৎ বাধা পড়ল। ভীষণ চমকে উঠল ছেলেটা। উঠে দাঁড়িয়ে কোনোমতে থতমত খেয়ে বলল, "আই রাইস ইট।"

তেমন গুরুতর কোনো ভুল নয়। শুধু শব্দগুলো একটু আগেপিছে হয়ে গেছে। তবুও শাস্তি অবধারিত। হাসান মাস্টার বেত হাতে হৃষ্টচিত্তে এগিয়ে এলেন। চিত্রনাট্য তার ঠিক করা পথেই এগোচ্ছে। ক্লাসের শেষে একটু হাতের সুখ না করলে ঠিক জুত পাওয়া যায় না। আতঙ্কিত ছেলেটার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। কিছু বলতে হলো না। কাঁপতে কাঁপতে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ছেলেটা। সপাটে চিকন বেত আছড়ে পড়ল কোমল হাতে। ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না সামলালো ছেলেটা।

তৃপ্ত মুখে ক্লাসের উপর চোখ বোলালেন হাসান মাস্টার। সবাই ভয়ে মিইয়ে গেল। এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে তার দৃষ্টি তমালের উপর এসে নিবদ্ধ হলো। চোখের ইশারায় তমালকে দাঁড়াতে বললেন তিনি। তমাল উঠে দাঁড়াল। প্রশ্ন করলেন তিনি, "তুই বল, আমি ভাত খাই–ইংরেজি।"

দ্বিধাহীনভাবে এক মুহূর্ত দেরি না করে তমাল বলল, "আই ইট রাইস।"

দ্রুত দেওয়া উত্তরে হকচকিয়ে গেল সবাই। সবচেয়ে বেশি চমকালেন হাসান মাস্টার নিজে। এত সাবলীল উত্তর কখনও ছাত্রদের কাছ থেকে পাননি তিনি। প্রশ্ন করে ছাত্র পেটাতেই অভ্যস্ত তিনি। খুব সতর্কভাবে পরের প্রশ্নটা নিজের স্বল্প জ্ঞানের ঝুলি থেকে বেছে নিলেন হাসান মাস্টার। হেরে গেলে চলবে না। জিজ্ঞেস করলেন, "সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে–ইংরেজি কর।"

আরও দৃঢ় স্বরে জবাব দিলো তমাল, "সূর্য ঘোরে না স্যার। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। আপনি ভুল বলছেন।"

ছাত্রের বেয়াদবিতে ভীষণ রেগে গেলেন হাসান মাস্টার। গর্জে উঠলেন তিনি, "চোপ বেয়াদপ। মুখে মুখে তর্ক। সূর্য ঘোরে না! পৃথিবী ঘোরে! পৃথিবী ঘুরলে তুই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কীভাবে?" বলে আর দেরি করলেন না তিনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দক্ষ এবং পারদর্শী হাতে বিদ্যুৎ গতিতে আট দশটা বেতের আঘাত চালান হয়ে গেল তমালের পিঠে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, হাত দিয়ে বাধা দেয়া কিংবা স্যারের পা জড়িয়ে ধরা কোনো উপায়ই জানা নেই তমালের। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো তার। লজ্জার কারণে শব্দ করে কাঁদতে পারছে না সে। কিছুক্ষণ পর পর ফুঁপিয়ে উঠছে। কান্না দেখে মাস্টারের মন একটু নরম হলো। প্রশ্ন করলেন, "তোকে তো ক্লাসে নতুন দেখছি। তোর নাম কী? কোত্থেকে এসেছিস?"

ফোঁপানোর জন্য কথা বলতে পারল না তমাল। পেছন থেকে একটা ছেলে বলে উঠল, "এইটা স্যার নতুন মাল। শহর থেকে এসেছে।"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ক্লাস। মাস্টার সাহেবও হাসিতে যোগ দিলেন। বেত চালানোর পর মন ফুরফুরে হয়ে গেছে হাসান মাস্টারের। তখন ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা বাজল। অট্টহাসিরত ক্লাসকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন হাসান মাস্টার।

স্যার চলে যেতেই ক্লাসের ছেলেগুলো সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল তমালের দিকে। তমাল কারও সাথে কথা বলল না। মাথা নিচু করে বসে রইল সে। একে একে বাংলা, ধর্ম, বিজ্ঞান ক্লাসগুলো শেষ হলো। এই ক্লাসগুলোতে আপত্তিকর কিছু ঘটল না। অবশ্য পুরোটা সময় তমাল চুপচাপ বসে ছিল। একবারও মাথা তোলেনি।

সবশেষে গণিত ক্লাস। গণিতের শিক্ষককে মোটামুটি পছন্দ হলো তমালের। গণিত তার পছন্দের বিষয়।

গণিতের শিক্ষকের নাম সৈকত। রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের মতো না হলেও মোটামুটি স্মার্ট তিনি। মন্দের ভালো আর কি। তেমনই মনে হলো তমালের কাছে। অন্যান্য শিক্ষকদের মতো আধবুড়ো নন তিনি। বয়স ত্রিশের কোঠায়। হাসি-খুশি, প্রাণোচ্ছল একজন মানুষ। পিথাগোরাসের উপপাদ্য এমনভাবে পড়ালেন যেন বাচ্চাদের কোনো মজার রূপকথা শোনাচ্ছেন তিনি। ভালোই পড়ালেন। পড়ানোর স্টাইলটা তমালের বেশ পছন্দ হলো। পড়ানো শেষে বললেন, "তোমরা কি জানো, বর্গক্ষেত্র ছাড়াও আরও একটা জ্যামিতিক ক্ষেত্র আছে যা পিথাগোরাসের উপপাদ্য মেনে চলে।"

তিনি প্রশ্ন করেননি, ছাত্রদের বোঝানোর জন্য কথাটা বলছিলেন। কিন্তু তমাল হাত তুলল। ইংরেজির শিক্ষক হাসান সাহেবের মতো সৈকত স্যারও অবাক হলেন। এই স্কুলের ক্লাস টেনের ছেলেরা এই প্রশ্ন বুঝতেই খাবি খাবে, সেখানে ক্লাস এইটের একটা ছেলের উত্তর দেবার জন্য হাত তোলাটা অবাক করার মতোই ঘটনা। চশমাটা খুলে হাতে নিলেন সৈকত স্যার। তারপর বললেন, "বল।"

উঠে দাঁড়িয়ে শুরু করল তমাল, "পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বাকি দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান। এখন, আমরা যদি বর্গক্ষেত্রের বদলে সমবাহু ত্রিভুজ বিবেচনা করি তবে একই ফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাকি দুই বাহুর উপর অঙ্কিত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের যোগফলের সমান হবে।"

বাচনভঙ্গি আর কথা বলার গতিতে চমৎকৃত হলেন সৈকত স্যার। সম্পূর্ণ নির্ভুল আর যুক্তিযুক্ত উত্তর। জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "তোমাকে তো ক্লাসে আগে কখনও দেখিনি। নতুন এসেছো?"

"জি, স্যার।"

"কোথা থেকে এসেছ?"

"ঢাকা থেকে। আমার বাবার কোম্পানি বাবাকে বদলি করেছে এখানে।"

"ঢাকায় কোন স্কুলে ছিলে?"

"ধানমণ্ডি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল।"

এতক্ষণে রহস্যটা পরিষ্কার হলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার কারণে ঢাকার স্কুল সম্পর্কে ভালোই ধারণা আছে সৈকত স্যারের। তমাল ঢাকার প্রথম শ্রেণির স্কুলের ছাত্র ছিল। মেধাবী ছাত্র না হলে ওসব জায়গায় চান্স পাওয়া যায় না।

সহজ সুরে সৈকত স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এত ফিটফাট হয়ে এসেছ কেন? এটা গ্রামের স্কুল। তোমাদের ঢাকার স্কুলের মতো এখানে পোশাকের বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি যে কোনো পোশাক পরে আসতে পারো।"

কাটা স্বরে জবাব দিলো তমাল, "পরিপাটি পোশাকে স্কুলে আসা একটা আবশ্যক নিয়ম। পোশাক আমাদের চিন্তাকে প্রতিফলিত করে। সুন্দর পোশাক সুন্দর মনের পরিচায়ক।"